Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনিকা ইসলাম তাসনিম

রোলঃ 216020202

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনিকা ইসলাম তাসনিম

রোলঃ 216020202

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বর্ণবাদ ও ইসলাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আনিকা ইসলাম তাসনিম, আইডিঃ 216020202 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বর্ণবাদ ও ইসলাম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীমস উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

আনিকা ইসলাম তাসনিম

আইডিঃ 216020202

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা:..5

বর্ণবাদ কী:..5

কিভাবে এলো বর্ণবাদ : 7

হিন্দুধর্মে বর্ণবাদ : 10

শূদ্রের নিচতা :...14

ইসলামে বর্ণবাদ :..16

আওস ও খাযরাজ :..21

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন :...22

দেখে যাও ইসলামের বর্ণবাদ :...24

পরিশেষে 29

ভুমিকা:

আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাতায়ালার যিনি আমার মত নগণ্য একজন বান্দাকে কলম ধরার তৌফিক দিয়েছেন আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ওস্তাদের যাদের থেকে ইলম অর্জন করছি ,যারা আমাদের জন্য অত্যন্ত মেহনত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ওস্তাদদের আমলে হায়াতে বারাকাত দান করুন এবং দ্বীনের জন্য কবুল করুন আমাদের আইওএম কে আল্লাহ তাআলার কামিয়াব দান করুন।

বক্ষমান এই কিতাবটিতে ইসলাম ও বর্ণবাদ সম্পর্কিত কিছু লিখবো ইনশাআল্লাহ । মূলত আলিমদের লেখা এবং কিছু বই থেকে নেওয়া । বলা যেতে পারে আলিমদের লেখাগুলো আমি একত্রিত করেছি মাত্র এতোটুকুই। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

যা কিছু ভালো আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ভুল আমার অজ্ঞতা এবং শয়তানের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা সুন্দর সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার ভরপুর তৌফিক দান করুন ।
আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন আমীন ।

বর্ণবাদ কী:

বর্ণবাদ অর্থাৎ জাতিভেদ, জাতিগত বৈষম্য কিংবা গাত্রবর্ণ দাড়াও হতে পারে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণবাদ সেই নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে বিশ্বাস করা হয় মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত ।এখানে তার উপর কর্তিত্ব করা হয় গাত্রবর্ণ দিয়ে।

তবে বর্ণবাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করার কঠিন গবেষকদের মাঝে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।বর্ণবাদ কখনো গায়ের চামড়ার রঙ দিয়ে হতে পারে, কখনো জাতি, কখনো বা আঞ্চলিকতার উপর ভিত্তি করে হতে পারে।

প্রফেসর সালাহ বাদির 'আত-তাফরিকাতুল উনসুরিয়্যাহ ফি ইফরিকিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "রেসিজম হল একটা আধিপত্য ও কতৃত্ববাদী মতবাদ। বিশেষত যারা নিজেদেরকে মনে করে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর উপর মোড়লের পদে বিদ্যমান। শুধু মানসিকভাবে এই বোধ লালন করলেই রেসিজমের অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ পায় না। এর জন্য প্রয়োজন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই বোধ ও বিশ্বাসের বাস্তবায়ন। এটা অনেকটা রেসিজমের সেক্যুলার পরিচয়। আর ধর্মীয় দিক থেকেও রেসিজমের প্রয়োগ বিদ্যমান। আর সেটা হল, নিজেদেরকে যুক্তিহীনভাবে গোঁয়াড়িপনাবসত শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করা। পুরো বিশ্বের মুক্তি ও সংস্কার যে গোষ্ঠী নিজেদের একক অধিকার বলে মনে করে, তারাও ডুবে আছে রেসিজমে। আর এই মনোভাব জায়নবাদী ইহুদি ধর্মে পুরোপুরি বিদ্যমান।"

উইলিয়াম জে. 'Races & People' নামক গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "রেসিজম হল নিজেদেরকে ছাড়া অন্যান্য যে কোন গোষ্ঠীকে মূলৎপাটনের চেষ্টা অথবা মানুষ হিসেবে তাদের অস্তিত্ব নাকচকরণ। এরই ফলাফলে তারা নিজেদেরকে মনে করে শ্রেষ্ঠতর। আর অন্যদেরকে করে তুচ্ছ-জ্ঞান। এই তুচ্ছ চোখে দেখার কারণেই অন্যদের মাঝে কোন ঐশ্বর্য বা অর্জন দেখলে তা আত্মসাৎ করার প্রয়াসও কম থাকে না তাদের। এজন্যই অনেক বিশ্লেষকের মতে, প্রত্যেক উপনিবেশিকতা জন্ম দেয় একেকটি বর্ণবাদের, তবে প্রত্যেক বর্ণবাদ জন্ম হয় না উপনিবেশিকতার উদরে। রেসিজমের

আরেকটি রূপ হল, বৈষম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে, মানবজাতির এক অংশকে শ্রেষ্ঠ, আরেক অংশকে হেয়তর বলে মনে করা।”

কিভাবে এলো বর্ণবাদ :

গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে কোনো জনগোষ্ঠী সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণ করাকে বর্ণবাদ বলে। বর্ণবাদ মানেই বর্ণবৈষম্য। সাদা কালোয় ভেদাভেদ। হাল জমানায় এসে এই বর্ণবাদ কেবল গাত্রবর্ণের বৈষম্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জাতি-গোষ্ঠী, দেশ-শ্রেণী এমনকি ধর্ম বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেও ‘বর্ণবাদ’ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে আন্দোলন হয়েছে। আইন হয়েছে। হয়েছে নীতিমালাও। এমনটি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন-কমিশনও। কিন্তু কেন থামছে না এই বৈষম্যপনা? কেন মানুষ মেনে নিচ্ছে না জন্মগত ভিন্নতার এই আবরণকে?

বর্ণবাদ বা আপার্টহাইট। আফ্রিকান ভাষায় এর অর্থ হল ‘বিভাজন’ বা ‘বিচ্ছিন্নতা’। এটি দক্ষিণ আফ্রিকা আর দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাতে নব্বইের দশক পর্যন্ত চলা জাতিগত বিভাজনের একটি ব্যবস্থা। তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ শাসিত সরকার আইন করে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয়, বর্ণসংকর ইত্যাদি বর্ণে ভাগ করে। এভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী মূল ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

১৯৩০ সালে প্রথম বর্ণবাদ শব্দের উৎপত্তি হয়। চল্লিশের দশকের শুরু থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় পার্টি রাজনৈতিক স্লোগানে এর ব্যবহার শুরু করে। তবে শব্দটির সাথে জড়িত নীতির উদ্ভব আরও আগে। ১৬৫২ সালে আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গ মানুষের বসতি স্থাপন শুরুর থেকে এই নীতির প্রচলন শুরু হয়। ঐ সময় ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানি দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ কলোনি স্থাপন করেছিল। ১৭৯৫ সালে ব্রিটিশরা কেপ কলোনি দখল করে নেয়। ব্রিটিশরা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা বিরতির বিশ্রাম ও দাস ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ এলাকা দখল করে। এবং এভাবে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনে উৎসাহী হয়।

১৮৬৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে হীরে ও ১৮৮৪ সালে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এসব মূল্যবান সম্পদের সন্ধানে বহিরাগতর উপস্থিতি বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসী, ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি ও ডাচ-বুয়রদের মধ্যে ত্রিমুখি লড়াই আরম্ভ হয়। এভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যেমনঃ সাদাদের রাজনৈতিক দল হল ‘ন্যাশনাল পার্টি’, আর কালোদের ‘আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস’। ১৯৪৮ সালের নির্বাচনে সাদাদের ন্যাশনাল পার্টি জয়ী হয়। শ্বেতঙ্গ শাসক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে অশেতাঙ্গদের। এর ফলে যে নীতি নিতে হয়-তাই ‘আপার্টহাইট’ বা বর্ণবৈষম্য নীতি। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাদা, কালো, বর্ণময় বা কালারড ও ইন্ডিয়ান-এই চার ভাগে ভাগ করে ফেলা হল। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার সে সময় একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। এটি তখন ‘পাসপত্র আইন’ নামে পরিচিত। আইনে বলা হয়, কৃষ্ণাঙ্গদের সব সময় তাদের পরিচয় সংক্রান্ত নথিপত্র বহন করতে হবে।

বর্ণবাদ সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, এটা একটা বিশ্বাস। বর্ণবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিগুলোকে বিভাজিত বর্ণের আলোকে দেখা হয়। বল্লাল সেনের বর্ণপ্রথার মতো। আর এর মাধ্যমে কোন একটি গোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিন্নতাকে ভালো ও উন্নত বিবেচনা করা হয়। যেমন; আমরা ইউরোপের অনেক ধারণাকে এখন শ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিয়ে অনুকরণের চেষ্টা করছি। নিশ্চিত নই এর জন্য আমাদের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু দায়ী।

আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে বর্ণবাদের সম্পর্ক নিবিড়। ঔপনিবেশিককালের জ্ঞানকাণ্ড, বিশেষত জীববিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান চর্চার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল বর্ণবাদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবিত করা। এমনকি সাহিত্যকর্মে আমাদের দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে কাউকে কাউকে ঔপেনিবেশিক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিতে দেখেছি। আবার গান্ধিজী বর্ণবাদের শিকার হয়েই ভারতে ফিরে এসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলেন

ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে বর্ণবাদ ন্যূনতম গত পাঁচ শতাব্দী ধরে পশ্চিমা বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যদিও নিকট অতীতে বর্ণবাদ দাসপ্রথার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী কাল প্রবাহে এটি আর দাস ব্যবসা ও প্রথায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমেরিকা ও ইউরোপে দাসপ্রথা উঠে গেলেও বর্ণবাদ রয়ে যায় কালো বা ইউরোপিয়ান সাদা নন এমন নাগরিকদের প্রতি নানা ধরনের বঞ্চনা ও বৈষম্য আরোপের মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের নাগরিক অধিকার আন্দোলন এই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ।

এর আগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্ণবাদকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে ঔপেনিবেশিক সমর্থক সমাজবিজ্ঞানীরা। এ সময় তারা সমাজ বির্বতনের একরৈখিক তত্ত্ব প্রচার করতে লাগলেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেকটি জাতি ও সংস্কৃতি উন্নতির কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে। বলাবাহুল্য, তাদের এই তত্ত্বমতে ইউরোপিয়ানরা সেই স্তরে পৌছে গেছে— তাই অন্যদের শাসন করার অধিকার তাদের আছে।

সুত্র : পাবলিক রিয়্যাকশন।

হিন্দুধর্মে বর্ণবাদ :

ইসলাম ধর্মের ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হল ভিত্তি হল কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ভিত্তি হল জাতপাতের উপর ।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মত, পথ এবং জাতিগোষ্ঠী আছে ।সকলের মধ্যে প্রযোজ্য একটি স্বাধীন প্রথা বা সিস্টেম হলো জাতিভেদ প্রথা ।সকল হিন্দু চারটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত ।এগুলো হলো - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র । কিন্তু চার বর্ণের ব্রাহ্মণ্য প্রথাটি হিন্দু বিশ্বাসে এখনো দৃঢ়মূল। এই দৃঢ়মূল ভিত্তির বদৌলতে হিন্দু এখন প্রধান প্রধান ৪৬৩৫টি জাতিগত উপজাতিতে বিভক্ত ।উল্লেখ্য এই ৪৬৩৫টি জাত উপজাত উপর থেকে নিচে এই ক্রমে স্তরে স্তরে সাজানো ।একটি অপরটি থেকে পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা। এক জাতের সাথে আরেক জাতের বৈবাহিক বা সামাজিক কোনো সম্পর্ক নেই ।তাদের রয়েছে যার যার সমাজ রীতি নীতি সংস্কার বা কুসংস্কার। সামাজিক গতিশীলতার পথ এখানে রুদ্ধ কারণ অর্থবিদ্যা এবং অক্ষমতা এর কোনটাই সাধারণভাবে এক জাতির লোকদের অপর জাতিতে উন্নীত করতে পারে না ।ব্যবস্থাটি জন্মগত ও বংশগত হওয়ায় একজনের জন্ম যে যাতে তার মৃত্যু হয় সেই যাতে।

নিচে আমরা এই চারটি জাত নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ।

ব্রাহ্মণ :

ব্রাহ্মণ গন হলেন হিন্দু সমাজে সর্বোচ্চ স্তরের জাতি ,রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক ও পালক একমাত্র তারাই। পূজা অর্চনা আরাধনায় পৌরহিত্য করতে পারেন। অপর সকল হিন্দু জাতের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা তাদের প্রাপ্য ।পূজার সময় একমাত্র পুরোহিত দেবতা সন্নিধ্যানে থাকতে পারেন। তাই মন্দিরের আকার মসজিদের মতো প্রশস্ত বা বৃহৎ নয়

। এরা হলো আরজদের যারা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল বা রাজা ছিল । তাদের দায়িত্ব কম অধিকার বেশি । বাকি জাতের লোকেরা তাদের খেদমত করবে । হিন্দুদের বিশ্বাস ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম বা সৃষ্টি তাই তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

ক্ষত্রিয় :

ক্ষত্রিয়গন হলেন যোদ্ধার জাত রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক। তারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং রাজ্যের শাসন দায়িত্বে থাকবেন ।রাজা হলে বংশানুক্রমে অথবা সাময়িক শক্তি বলে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন । এরা হলো তারাই যারা আর্যদের সাথে যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতে এসেছিল। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হল ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি ব্রহ্মার বাহু থেকে তাই তারা শক্তিশালী ও যোদ্ধা।

বৈশ্য :

বৈশ্যগন হলেন ব্যবসায়ী শ্রেণী কৃষি ,ব্যবসা দ্বারা সমাজের ধন-সম্পদের উৎপাদক ও পালক। তাদের কাজ হল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ,শিল্প ,কলকারখানা ইত্যাদির মালিক হওয়া এবং পরিচালনা করা । এরা ছিল তারা দ্রাবিড়দের মধ্যে যারা আর্যদের সমর্থন করেছিল। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হলো ব্রহ্মার উরু থেকে বৈশ্য এর সৃষ্টি।

শুদ্র :

শূদ্রগণ হলেন সেবক শ্রেণী; পরিশ্রমের দ্বারা সমাজের সেবক ও পোষক । তাদের কাজ হল উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা করা ,তাদের চাকরগিরি করা । এরা ছিল হিন্দুস্তানে দ্রাবিড়দের মধ্যে যারা আর্যদের বিরোধিতা করেছিল । এরা সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ । ক্ষত্রিয়গণের যদি তাদের ছায়ায় পা পড়ে যায় বা তাদের স্পর্শ লাগে তাহলে তারা

নাপাক হয়ে যায়। কোন পূজা অর্চনা করা বা কোন অনুষ্ঠানে বা মন্দিরে যাবার তাদের কোন অধিকার নেই । তারা সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত । এদের দায়িত্ব বেশি অধিকার কম । হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস , যশূদ্রদের সৃষ্টি হল ব্রহ্মার পা থেকে তাই তারা পায়ের জাত ,নিচু জাত।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব :

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান কেবল অন্যান্য জাতের উপরেই নয় বরং ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্ট হওয়ার কারণে সে সৃষ্টির প্রভু সে বেত ধারণ করবে কারণ ধর্মের জন্যই তার সৃষ্টি পৃথিবী যা কিছু সম্পদ সবাই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সবকিছু সে একাই পাওয়ার যোগ্য সে যা খায় যা পরিধান করে সময় তার নিজের কারণ সবকিছুতেই তার একচ্ছত্র অধিকার । অন্যেরা যা ভোগ করে তার মূলে রয়েছে ব্রাহ্মণের দয়া। ব্রাহ্মণেরা অধিকার দিয়েছে বলেই তারা সেটুকু ভোগ করতে পারছে ব্রাহ্মণ মূর্খ হলেও তাতে অসুবিধা কোন কারণ নেই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে অগ্নি দেখা যাক বা না যাক তা মহাদেবতা তেমনি ব্রাহ্মণ বিদ্বান হোক না হোক সব সময় মহা দেবতা শ্মশানের অগ্নি যেমন দূষিত হয় না তেমনি সমুদয় কুৎসিত কাজে লিপ্ত থাকলেও ব্রাহ্মণ সদা পূজনীয় সব মানুষের পরম দেবতা কেবল জন্মের দাবিতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মের ধারায় সে দেবতাদের দেবতা তার উপদেশ ঐ লোকের কাছে ক্রমান্য কারণ তা হলো দেবভিত্তিক।

জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ব্রাহ্মণকে বিবাহের বেলায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেয়া হয়েছে হিন্দু সমাজে বিবাহ রীতি আটটি ব্রাহ্ম ,দৈব ,আর্য ,প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধরব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ। এসব বৃতির মধ্যে প্রথম ছয়টি দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে ক্ষত্রিয়কেবল চারটি এবং বৈশ্য ও শূদ্র মাত্র তিনটি রীতি গ্রহণ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ কে সমাজ স্বীকৃত ছয়টি বিবাহ রীতি ব্যবহারের সুযোগ দেয়াতে সে যেকোনো সময় নিজের পছন্দ মত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে । এসব রীতিতে পিতা পাত্রকে কন্যাদান করতে পারে , পাত্র-পাত্রী নিজেরাই একে অপরকে পছন্দ করতে পারে কিংবা পাত্রীর অমতেই পুরুষ বলপূর্বক হরণ কিংবা ধর্ষণ করে তাকে অধিগত করতে পারে ফলে যাদের ক্ষেত্রে যতগুলো বেশি রীতি প্রযুক্ত, স্ত্রী রত্নের ভান্ডারটি তাদের ততই সমৃদ্ধ হয়ে পাবার সুযোগ।

বিচারব্যবস্থায়ও ব্রাহ্মণদের জন্য রয়েছে অনেকটা বাড়তি সুবিধা অন্য জীবনের সাক্ষীকে নানা ধরনের মানসিক সামাজিক ও ধর্মীয় চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে ব্রাহ্মণ সাক্ষী কে কিন্তু কেবল অনুরোধ করা যাবে, আপনি কি জানেন তা বলুন ব্রাহ্মণের যেকোন অপরাধে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে তার ধনরত্নসহ অক্ষত দেহে নির্বাসন দেয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় কিছু শ্লোক এর বিবরণ দেওয়া হলো-

ক. স্রষ্টা ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে সৃষ্টি করেছেন .

খ. স্থাবর জমির মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ প্রাণী দের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ আর মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ।

গ. পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি শ্রেষ্ঠত্ব, অভিযাত্ব হেতু ব্রাহ্মণ সবই পাওয়ার যোগ্য ইত্যাদি।

শূদ্রের নিচতা :

শুদ্র সম্প্রদায়ের স্থান সমাজের সর্বনিচের ধাপে। কারণ তাদের জন্ম স্রষ্টার পা থেকে । স্রষ্টা তার জন্য মাত্র একটি কাজ নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হল অন্য ত্রিবর্ণের লোকদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবা করা । অন্যান্য বর্ণের লোকেরা যেসব পথে স্বর্গে যেতে পারে শূদ্রের জন্য তা খোলা নেই । তার জন্য স্বর্গ লাভ করার একমাত্র পথ ব্রাহ্মণদের সেবা করা।

বিবাহের যে বিধান হিন্দু শাস্ত্রে রয়েছে সমুদ্রের জন্য তাও বৈষম্যমূলক পূর্ব উল্লিখিত আট ধরনের বিবাহের মধ্যে যেসব পদ্ধতি ব্রাহ্মণদের জন্য অশুভ বলা হয়েছে সমুদ্রের জন্য সেগুলোই করণীয় হিসেবে নির্দেশ রয়েছে উচ্চ বয়ানে পুরুষ নিম্ন বর্ণের কন্যা বিবাহ করতে পারে কিন্তু তার উল্টোটা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ।

হিন্দু শাস্ত্রের যে বিচার ব্যবস্থা রয়েছে শূদ্রের জন্য তা কেবল বৈষম্যমূলক নয় নিপীড়নমূলকও

শূদ্র যে অপরাধ ই করুক না কেন তার সাজা সব সময়ই চরম। সে কোন ব্রাহ্মণকে চোর বলে গালি দিলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আবার ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে একই গালি দেয় তবে তার দন্ড মাত্র ১২ পন। তার মানে যে অপরাধের কারণে এক পক্ষের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সে একই অপরাধ করলে অপর পক্ষের জরিমানা করা হবে মাত্র ১২ পন । যদি কোন শূদ্র পাপবাচক শব্দ উচ্চারণ করে কর্কশ ভাবে কোন দ্বিজকে গালি দেয় তবে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে হবে। যদি সে নাম বা জাতি উল্লেখ করে গালি দেয় তবে তার মুখের মধ্যে দশ আঙ্গুল লম্বা জ্বলন্ত লৌহ শলাকা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয় তবে তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তেল ঢেলে দিতে হবে । একটু সাহস করে যদি সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসতে চায় তবে

উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা কটি দেশ পুড়িয়ে দিয়ে তাকে নির্বাসন দেয়া হবে। যদি সে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে বা তাকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেয় তবে নাক , কান কেটে তাকে কষ্টদায়ক ভাবে হত্যা করতে হবে। নিম্নবর্ণের কোন লোক যদি উচ্চবর্ণের কোন নারীকে ধর্ষণ করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । তবে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শূদ্র কন্যাকে ধর্ষণ করলে তার দ্বন্দ্ব হবে মাত্র সহস্রপণ আর ব্রাহ্মণের বেলায় তা হবে মাত্র ৫০০ পন।

প্রায়শ্চিত্তের বেলায় শুদ্রকে বিড়াল ,কুকুর , নেউল, কাক, পেঁচা, ব্যাংগ প্রভৃতির সমতুল্য করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের কোন লোক এসব ইতর প্রাণীকে বধ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় , শূদ্র হত্যার বেলায়ও তা করার বিধান রয়েছে।

সূত্র যেহেতু অপবিত্র কাজেই সে ব্রাহ্মণদের থেকে দূরে থাকে সে প্রতিমাসে একবার চুল কাটাবে যাতে সহজে তাকে চেনা যায় এর কারণ ব্রাহ্মণরা যাতে সব সময় নিজেদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তার থেকে দূরে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করা মৃত্যুর পরও শূদ্রের শূদ্রত্ব বহাল থাকে। ব্রাহ্মণের মৃতদেহকে নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু শূদ্রকে নিতে হয় দক্ষিণদ্বার দিয়ে।

দেখা যাক, মনু শূদ্রদের সম্পর্কে কি বলে ?

১. শূদ্রদের বা দাসদের নিজস্ব কোন সম্পত্তি রাখার অধিকার নেই ।

২. দাস ও শূদ্রদের ধর্ম ব্রাহ্মণ অবাধে নিজের কাজে প্রয়োগ করবে ।

৩. শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করতে পারবে না কারণ তার সম্পদ থাকলে সে গর্ব ভরে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করতে পারে ।

৪. প্রভুর উচ্ছিস উচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য ।

৫. দাস বৃত্তি থেকে শূদ্রের কোন মুক্তি নেই ।

৬. যজ্ঞের কোন দ্রব্য শূদ্র পাবে না ।

৭. যে পথে উচ্চবর্ণের লোকেরা যাতায়াত করে সে পথে মৃত শূদ্রেরও বহন করা যাবে না। (১)

(১)"হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পথ ও পদ্ধতি" বই থেকে নেয়া।

ইসলামে বর্ণবাদ :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা জীবনের প্রতিটি পড়তে পড়তে আছে ইসলামের সমাধান ইসলামে নেই কোন বর্ণ বৈষম্য বা জাতিগত বৈষম্য নেই কালের উপর সাদার প্রাধান্য কিংবা কোন জাতির উপর। হিন্দু ধর্মে যেমন জাত পাত আছে ইসলামে তা নেই। হিন্দু ধর্মে যেখানে শূদ্রেরদের সবচেয়ে নিচু ভাবা হয় ,তাদের কোন অধিকার নেই ,সবকিছু থেকে বঞ্চিত এমনকি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করাটাও তাদের জন্য দোষের। ব্রাহ্মণের কাছে বসতে চাওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ,অথচ ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত । ইসলামে প্রত্যেক নর-নারীর উপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

‘আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয।’

এবং তারা আলেমদের কাছে যেতে পারবে তাদের সাথে মিশতে পারবে আলেমদের থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং সাহাবীদের কেও নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা পৌঁছে দাও যদিও একটি আয়াত হয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِ
وَسَلَّم : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة ً

’আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার পক্ষ হতে (মানুষের কাছে) একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও।’

[সহীহ : বুখারী ৩৪৬১]

ইসলামী শরীয়তে ধনী-গরিব কোন মুখ্য বিষয় নয় বরং একটাই হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা শুধু আমাদের অন্তর দেখেন আমাদের এখলাস দেখেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বাহ্যিক দিক দেখেন না দেখেন আমাদের অন্তর।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَعَنْ أبي هُرَيْرة عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ صخْرٍ رضي الله عَنْهُ قال : قالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم: »إنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى أَجْسامِكُم ، وَلا إلى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمالِكُمْ
« رواه مسلم

আব্দুর রহমান ইবনু সাখর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।''[1]

[1] সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন। -সুরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৩

ইসলামে বহু দল উপদল রয়েছে রয়েছে বিভিন্ন মত তবুও ইসলামে এহেন বিদ্বেষ ও বৈষম্য কখনো দানা বাঁধতে পারেনি।

প্রথমত, আমরা সকলেই এক আল্লাহর গোলাম ভাষাগত পার্থক্য ও বর্ণগত পার্থক্য আল্লাহ তায়ালার এক অসীম নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।’ -সুরা রুম : আয়াত ২২

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন; আর আমি তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বর্ণের পথ-শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। এভাবে রংবেরঙের মানুষ, কীটপতঙ্গ ও জন্তু'- (সুরা ফাতির, আয়াত ২৭-২৮)।

দ্বিতীয়ত, জন্মগতভাবে মানুষ কেন সাদা-কালো হয়, এর একটি ব্যাখ্যা হাদিসে এসেছে। রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আকস্মিক তাঁর কুদরতি থাবায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে একমুঠো মাটি নিয়ে হজরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। ফলে মাটির গুণাবলির দরুন আদম সন্তানও লাল-সাদা-কালো-হলুদ বর্ণের হয়েছে'- (তিরমিজি, ২৯৫৫) ।

আল্লাহর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষনে বলেন,

أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم ،ْ

মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত’। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।

[1]. বায়হাক্বী -শো‘আব হা/৫১৩৭; আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুসলমানদের জীবনাচরণও সে ধাঁচেই গড়ে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায় করা। এখানে ধনী-গরীব, সাদা-কালো, উচু-নিচুর কোনো ভেদাভেদ নেই সকলে একসঙ্গে কাঁধে কাধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে,

যাকাতের মাধ্যমেও রয়েছে বৈষম্য :

জাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। ইসলামে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় ধনীরা তাদের সম্পদের কিছু অংশ জাকাত দিলে গরিবদের সম্পদ কিছুটা বেড়ে যায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হয়। জাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা মহানবি (সা.)-এর আদর্শ মদিনা রাষ্ট্র, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিমোচন করে মুসলিম উম্মাহকে সমকালীন বিশ্বে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিল।

যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করে। সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি দূর করে সম্পদের বৈষম্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানা কে অস্বীকার করা হয়নি এবং কার্যহীনও রাখা হয়নি।

এই অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অর্জনের যেকোনো পন্থাকে বৈধতা দেওয়া হয়নি। বরং সম্পদ ধনীদের থেকে গরিবদের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়'। সূরা হাশর - ৫৯ সর্বোপরি কথা হল যাকাত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি করুণা নয় বরং এটা তাদের অধিকার আল্লাহ তায়ালা যেমন ধনীদের সম্পদ দিয়েছেন তেমনি তার সম্পদে

গরিবের হক ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে 'আর তাদের সম্পদে হক রয়েছে প্রার্থনাকারীদের ও বঞ্চিতদের জন্য'। সূরা মাআরিজ - ৭০

আওস ও খাযরাজ :

হিজরতকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়াছরিবে মূলতঃ দু'দল লোক বসবাস করত। একদল ছিল ইয়াছরিবের পৌত্তলিক মুশরিক সম্প্রদায়। যারা প্রধানতঃ আউস ও খাযরাজ দু'গোত্রে বিভক্ত ছিল। আউসদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন ওবাদাহ। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূল ছিলেন খাযরাজ গোত্রভুক্ত। এরা ছিল বিশুদ্ধ আরবী ভাষী। রাসূল (ছাঃ)-এর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারও ছিল এই গোত্রভুক্ত।

দ্বিতীয় ছিল ইহূদী সম্প্রদায়। খ্রিষ্টানরা যাদেরকে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে উৎখাত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপর দখল কায়েম করেছিল। ইহূদীরা শেষনবীর আগমনের অপেক্ষায় এবং তাঁর নেতৃত্বে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল বহুদিন পূর্বে। এরা ছিল হিব্রুভাষী। কিন্তু পরে আরবীভাষী হয়। এদের প্রধান তিনটি গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা', বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা মদীনার উপকণ্ঠে তাদের তৈরী স্ব স্ব দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহে বসবাস করত। দক্ষ ব্যবসায়ী ও সূদী কারবারী হওয়ার কারণে এরা ছিল সর্বাধিক সচ্ছল। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের মাধ্যমে এরা আউস ও খাযরাজের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখতো এবং 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতির মাধ্যমে উভয় গোত্রের উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। এই সূক্ষ্ম পলিসির কারণে তাদের বনু ক্বায়নুক্বা' গোষ্ঠী খাযরাজদের মিত্র ছিল এবং বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোষ্ঠী আউসদের মিত্র ছিল। আসলে তারা উভয়েরই শত্রু ছিল। তাদেরকে তারা সূদী কারবার ও অস্ত্র ব্যবসার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। তারা এভাবে আরবদের শোষণ করত। এজন্য তাদের মূর্খতার প্রতি

তাচ্ছিল্য করে তারা বলত, لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّيْنَ سَبِيْل 'মূর্খদের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই' (আলে ইমরান ৩/৭৫)। অর্থাৎ মূর্খদের সম্পদ হরণ করায় ও তাদের অধিকার নষ্ট করায় আমাদের কোন পাপ নেই। সেই সময় ইয়াছরিবে পৌত্তলিক ও ইহূদীদের বাইরে কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টানও বসবাস করত। যারা ইহূদীদের ন্যায় ইয়াছরিবে হিজরত করে এসেছিল শেষনবীর আগমন প্রত্যাশায়।

আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রায়শই তারা যুদ্ধবিগ্রহে জড়াত।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন বানু আউস এবং বানু খাযরাজ তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগীতা করেন। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে এ উভয় গোত্রকে আনসার উপাধিতে ভূষিত করেন। একে-অপরের দ্বীনি ভাই হিসেবে বন্ধন তৈরি করে দেন। সুবহানাল্লাহ

এভাবেই আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈষম্য দূর করেছেন, আবদ্ধ করে দিয়েছেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে।

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন :

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে ছিলেন ? সুদর্শন কোন পুরুষ? নাকি যার বংশ মর্যাদা সবচেয়ে বেশি ? নাকি যার অর্থ-বৃত্ত প্রচুর ?এমন কেউ কি? না! এরকম কেউ নন, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন যিনি তিনি ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস যিনি ছিলেন উমাইয়া ইবনে খালফের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি উমাইয়া ইবনে খালফের দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতিত হন। উমাইয়ার নির্দেশে বেলাল রা: কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে রাখা হতো এবং তার বুকের উপর একটি বড় আকারের ভারী

পাথর রেখে দেয়া হতো। যে কারণে সে সময় তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যেত । এত কিছুর পরেও বিলাল অবিরাম আহাদ বলে চিৎকার করতে থাকতো। পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

হিজরতের পর মদিনায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি সর্বপ্রথম আযান দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন ।

সুবহানাল্লাহ যেখানে বিল্লাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সবচেয়ে নিচু চোখে দেখা হত ক্রীতদাস হিসেবে দেখা হতো যার কোন সম্মান ছিল না। ইসলাম গ্রহণ করে তিনিই হয়ে গেলেন সম্মানিত ব্যক্তি, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

শুধু তাই নয় ,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী হিসেবে প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী হওয়ার অগ্রিম সুসংবাদও তিনি নিজ জীবদ্দশাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার :

মদিনা একটি উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসেবে স্থায়িত্ব পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন ।বাইতুল মালের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ইসলামের প্রথম কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের বিলাল কে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন অবস্থান এনে দিয়েছিল। বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সকল লেনদেনের দেখাশোনা করতেন পাশাপাশি তিনি

বিধবা ,এতিম ,মুসাফির এবং অসহায় দরিদ্রদের বায়তুল মাল হতে অর্থ প্রদান করতেন।

দেখে যাও ইসলামের বর্ণবাদ :

এই গল্প এক আফ্রিকান কালো মেয়ের গল্প । জন্মদান না করে কেমন করে মেয়েটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মা হলেন , সেই গল্প।

মহীয়সী নারী হজরত উম্মে আয়মান, যিনি জন্ম থেকে আমৃত্যু মায়ের মমতা ও আদর-সোহাগ দিয়ে নবীজির দেখাশোনা করেছিলেন।

প্রিয় নবীজি (সা.) এর 'মা আমেনা' এবং 'দুধমাতা হালিমা'র কথা আমরা জানি! আমরা কি জানি! নবীজির (সা.) আরেক মা উম্মি আয়মানের পরিচয়?

উম্মে আয়মন (রা.) এর জন্ম মূলত আফ্রিকার আবিসিনিয়ায়। নবীজি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের ৫০ দিন আগে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য যখন আবরাহার বাহিনী অভিযান চালায়, সেই কাফেলার সঙ্গে আসেন এ উম্মে আয়মন। ক্রীতদাসী হিসেবে তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

আবরাহা বাহিনী ধ্বংস হওয়ার পরের ঘটনা। আমাদের নবী (সা.) এর পিতা আব্দুল্লাহ একদিন মক্কার বাজারে গিয়েছিলেন কেনাকাটা করার জন্য। এক জায়গায় তিনি দেখলেন, এক লোক কিছু দাস-দাসী নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে। আব্দুল্লাহ দেখলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট ৯ বছরের কালো আফ্রিকান মেয়ে । মেয়েটাকে দেখে আব্দুল্লাহর অনেক মায়া হলো, একটু রুগ্ণ হালকাগুপাতলা; কিন্তু

কেমন মায়াবী ও অসহায় দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি ভাবলেন ঘরে আমেনা একা থাকেন, মেয়েটা পাশে থাকলে তার একজন সঙ্গী হবে। এই ভেবে তিনি মেয়েটাকে কিনে নিলেন। মেয়েটিকে আব্দুল্লাহ ও আমেনা অনেক ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন ও এবং তারা লক্ষ্য করলেন যে, তাদের সংসারে আগের চেয়েও বেশি রহমত ও বরকত চলে এসেছে। এই কারণে আব্দুল্লাহ ও আমেনা মেয়েটিকে আদর করে নাম দিলেন বারাকাহ। মানে সৌভাগ্য, প্রাচুর্য, বারাকাত।

একদিন আব্দুল্লাহ ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া রওনা দিলেন। বিবি আমেনার সঙ্গে সেটাই ছিল তার শেষ বিদায় । তার যাত্রার দুই-একদিন পর আমেনা একরাতে স্বপ্নে দেখলেন, আকাশের ঝলমল উজ্জ্বল এক তারা যেন তার কোলে এসে পড়লো। পরদিন ভোরে তিনি বারাকাকে এই স্বপ্নের কথা বললেন। উত্তরে বারাকা মৃদু হেসে বললেন, আমার মন বলছে, আপনার কোল বেয়ে এক সুন্দর শিশু জন্ম নেবে। আমেনা তখনও জানতেন না তিনি গর্ভধারণ করেছেন; কিন্তু কিছুদিন পর তিনি বুঝতে পারলেন, বারাকার ধারণাই সত্যি।

আব্দুল্লাহ আর ফিরে আসেনি। সিরিয়া যাওয়ার পথেই মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। আমেনার সেই বিরহ ও কষ্টের সময়ে বারাকা ছিলেন সবচেয়ে কাছের ও একমাত্র সঙ্গী। একসময় আমেনার অপেক্ষা শেষ হয় এবং তিনি জন্ম দিলেন আমাদের প্রিয় নবীকে। শেখ ওমর সুলাইমানের বর্ণনা অনুযায়ী, সর্বপ্রথম আমাদের নবীকে দেখার ও স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল যে মানুষটির, সে হলো এই আফ্রিকান ক্রিতদাসী ছোট্ট কালো মেয়েটির। আমাদের নবীকে নিজ হাতে আমেনার কোলে তুলে দিয়েছিলেন, আনন্দে ও খুশিতে বলেছিলেন, আমি কল্পনায় ভেবেছিলাম সে হবে চাঁদের মতো; কিন্তু এখন দেখছি, সে যে চাঁদের চেয়েও সুন্দর।

এই সেই বারাকা! নবীজির জন্মের সময় তার বয়স ছিল তের বছর।

ছোটবেলায় বারাকা আমেনার সঙ্গে শিশু নবীর যত্ন নিয়েছেন, গোসল দিয়েছেন, খাওয়াতে সাহায্য করেছেন, আদর করে ঘুম পাড়িয়েছেন ও কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। নবীজি (সা.) এর বয়স যখন ৬ বছর তখন আমেনা শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে তার বাপের বাড়ি মদিনা মনোয়ারা থেকে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় আমেনা বারাকার হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তার সন্তানকে দেখেশুনে রাখেন এবং সুদূর আবওয়া থেকে মক্কায় নিয়ে আবদুল মুত্তালিবের হাতে তুলে দেন। উম্মে আয়মান সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আবওয়াতে মা আমেনার মাজার রয়েছে।

বাবা-মা দু’জনকেই হারিয়ে এতিম নবী চলে এলেন দাদা আবদুল মুত্তালিবের ঘরে। উত্তরাধিকার সূত্রে নবী হলেন বারাকার নতুন মনিব । কিন্তু তিনি একদিন বারাকাকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন, আপনি যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারেন, আপনি স্বাধীন। শিশুকাল থেকেই নবী এই ক্রীতদাস প্রথাকে দূর করতে চেয়েছিলেন ।

বারাকা নবীকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হলেন না; বরং মায়ের ছায়া হয়ে পাশে থেকে গেলেন। এমনকি নবীজির দাদা তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। তার সাফ কথা, আমি আমেনাকে কথা দিয়েছি, আমি কোথাও যাব না। তারপর একদিন খাদিজা (রা.) এর সঙ্গে নবীজির বিয়ে হলো। বিয়ের দিন রাসুল (সা.) খাদিজা (রা.) এর সঙ্গে বারাকাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তিনি হলেন আমার মায়ের পর আরেক মা।

বিয়ের পর রাসুল (সা.) একদিন বারাকাকে ডেকে বললেন, উম্মি! আমাকে দেখাশোনা করার জন্য এখন খাদিজা আছে, আপনাকে এখন বিয়ে করতেই হবে। নবীজি তাকে উম্মি ডাকতেন, নাম ধরে ডাকতেন না।

তারপর রাসুল (সা.) ও খাদিজা মিলে তাকে উবাইদ ইবনে জায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর বারাকার নিজের একটা ছেলে হলো, নাম আয়মান। এরপর থেকে বারাকার নতুন নাম হয়ে গেল উম্মে আয়মান।

একদিন বারাকার স্বামী উবাইদ মৃত্যুবরণ করেন। নবীজি গিয়ে আয়মান ও বারাকাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন এবং সেখানেই থাকতে দিলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর নবীজি একদিন বেশ কয়েকজন সাহাবিকে ডেকে বললেন,

আমি একজন নারীকে জানি, যার কোনো সম্পদ নেই, বয়স্ক এবং সঙ্গে একটা এতিম সন্তান আছে। কিন্তু তিনি জান্নাতি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একজন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চাও? এই কথা শুনে জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) নবীজির কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। নবীজি উম্মে আয়মানের সঙ্গে কথা বলে বিয়ের আয়োজন করলেন। বিয়ের দিন রাসুল (সা.) যায়েদকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে ও ভালোবাসায়, ভেজা চোখে, কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, তুমি কাকে বিয়ে করেছ জানো জায়েদ? হ্যাঁ, উম্মে আয়মানকে- যায়েদের উত্তর। নবীজি বললেন, না, তুমি বিয়ে করেছ, আমার মাকে। তার কোলেই জন্মগ্রহণ করেন হজরত উসামা ইবনে যায়েদ।

সাহাবিরা বলতেন- রাসুল (সা.)-কে খাওয়া নিয়ে কখনও জোর করা যেত না। তিনি সেটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু উম্মে আয়মান একমাত্র নারী, যিনি রাসুল (সা.)-কে খাবার দিয়ে খাও... খাও... বলে তাড়া দিতেন। আর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশে বসে থাকতেন । নবীজি মৃদু হেসে, চুপচাপ খেয়ে নিতেন।

রাসুল (সা.) তাঁর দুধ মাতা হালিমাকে দেখলে যেমন করে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে তার ওপর হালিমাকে বসতে দিতেন; ঠিক তেমনি মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ

যাত্রা শেষে উম্মে আয়মান যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, নবীজি তাঁর গায়ের চাদরের একটা অংশ পানিতে ভিজিয়ে, উম্মে আয়মানের মুখের ঘাম ও ধুলোবালি নিজ হাতে মুছে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, উম্মি! জান্নাতে আপনার এইরকম কোনো কষ্ট হবে না।

নবীজি ইন্তেকালের আগে সাহাবিদের অনেক কিছুই বলে গিয়েছিলেন। সেই সব কথার মধ্যে একটা ছিল, উম্মে আয়মানের কথা। বলেছেন, তোমরা উম্মে আয়মানের যত্ন নেবে, তিনি আমার মায়ের মতো ও তিনিই একমাত্র নারী, যিনি আমাকে জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন। আমার পরিবারের একমাত্র সদস্য, যিনি সারাজীবন আমার পাশে ছিলেন। সাহাবিরা সেই কথা রেখেছিলেন।

গায়ের রং নয়, এক সময়ের কোনো ক্রীতদাসী নয়, তার পরিচয় তিনি প্রিয় নবীর (সা.) আরেক মা। মায়ের মতোই রাসুলুল্লাহর সাহাবারা এই বৃদ্ধা নারীকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিলেন।

উম্মে আয়মন (রা) উহুদ যুদ্ধে সৈনিকদের পানি পান ও আহতদের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর লোকেরা যখন পলায়ন করছিলেন, তিনি অস্থির হয়ে পলায়নকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করতে থাকেন, যাচ্ছ কোথায়, ধরো ঢাল তলোয়ার নাও, রাসুলের চারপাশ থেকে শত্রুদের হটাও। তারপর রাসুলের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তিনি শান্ত হন।

হিবান ইবনে আরাকার নিক্ষিপ্ত তিরে তার সতর অনাবৃত হলে সে আনন্দে অট্টহাসি দিতে থাকে। এতে রাসুল দারুণ কষ্ট পান এবং হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসকে ধারবিহীন একটা তির নিক্ষেপ করতে বলেন, তিরের প্রচণ্ড আঘাত চিৎপটাং অবস্থায় সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পড়লে রাসুল (সা.) এমন অট্টহাসি দেন, যাতে তাঁর মাড়ির

দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। নবীজি বলেন, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস উম্মে আয়মন (রা.) এর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

এছাড়া তিনি খায়বার ও হুনাইন যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে অংশ নেন। হুনাইন যুদ্ধে তিনি ও তার ছেলে আয়মন মুসলমানদের বিপর্যয়ের সময় রাসুলের পাহারায় ছিলেন। তার ছেলে আয়মন এ যুদ্ধে শহীদ হন এবং মুতার যুদ্ধে তার দ্বিতীয় স্বামী মহান সেনাপতি হজরত জায়েদ বিন হারিসা শহীদ হন। তিনি সব ক্ষেত্রে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন; কিন্তু নবীজি (সা.) এর ইন্তেকালে তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন। হজরত আবু বকর ও ওমর (রা) তাকে দেখতে এলে তিনি অঝোর ধারায় কান্না করছিলেন। এত কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবীজি (সা.) ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে ওহি নাজিলের সিলসিলা যে বন্ধ হয়ে গেল। তার এ কথায় হজরত আবু বকর ও ওমর (রা.) উভয়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন।

তিনি হজরত উসমান (রা.) এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত হন। হজরত উসমান (রা.) তার জানাজায় ইমামতি করেন। এভাবেই একজন মহীয়সী নারীর বিদায় ঘটে।

(সূত্র : সিরাতে ইবনে হিশাম ও শেখ ওমর সুলাইমান)

পরিশেষে

মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবি মুহাজির ও মদিনার স্থানীয় সাহাবী আনসারদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্কই বলে দেয় ইসলাম কতবেশি উদার ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আরও কিছু দৃষ্টান্ত-- সুদূর পারস্যের ক্রীতদাস হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আহলে বাইতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেন- 'সালমান আমাদেরই ঘরের লোক।'

- হাবশি ক্রীতদাস বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। এ কালো বর্ণের সাহাবিকে দেয়া হয়েছিল নেতার মর্যাদা। তার সম্পর্কে এক ঘটনা-একবার বিশিষ্ট সাহাবি আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তর্কের এক পর্যায়ে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে বসলেন- 'কালো মায়ের সন্তান'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বিরক্ত হন। তিনি তখন আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের চিহ্ন রয়েছে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট একটি মন্তব্যের কারণে হজরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্যকে 'জাহেলিয়াত'-এর সাথে তুলনা করেছেন।

শুধু তা-ই নয়, কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামাজের আজান দেয়ার জন্য মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করেন।

- হজরত উসামাহ ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ তখনও হজরত আবু বকর, ওমর ও আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবিরা জীবিত ছিলেন।

এসব সাহাবিদের দ্বিধাহীন নেতৃত্ব ও আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন উচ্চ বংশ মর্যাদা ও নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন-'কিশমিশ আকারের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোনো হাবশি গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শুনবে এবং পূর্ণ আনুগত্য করবে।' (বুখারি)

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়আধুনিকতার এ সময়ে বর্ণবাদ একটি অন্যতম সমস্যা। এ বৈষম্য ও বর্ণবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে এখনো বৈষম্য ও বর্ণবাদের অবসান হয়নি। এমনকি এই বর্ণবাদের কারণেই বিশ্বব্যাপী এখনও অনেক মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে।

পরিশেষে...বিশ্ববাসীকে আজ এমন এক সমঝোতায় আসতে হবে, যাতে বর্ণবাদদের মতো কোনো ঘৃণ্য মতবাদ অস্তিত্ব না থাকে। যেন পৃথিবীজুড়ে ঘোষিত হয় মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক সে ঘোষণা-'জেনে রাখ! গর্ব অহঙ্কার গৌরব ও আভিজাত্যবোধ প্রভৃতির সব সম্পদ এবং রক্ত ও সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় অভিযোগ আজ আমার এই দুই পদতলে নিপিষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জাহেলি যুগের সব হিংসাবিদ্বেষ ও গর্ব অহঙ্কার এবং পৈতৃক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করে দিয়েছেন। হয়তো বা সে মুমিন-মুত্তাকি অথবা অন্যায়কারী দুর্ভাগা হবে। সব মানুষ আদম থেকে উৎসারিত। আর আদম মাটি থেকে।'

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে প্রত্যেকের সমান অধিকার সুনিশ্চিত। ইসলামের কোনো বিধানই বর্ণবাদের পক্ষে নয়। গোত্রতন্ত্র ও বর্ণবাদ নির্মূলে বিশ্বব্যাপী ইসলাম অনুপম আদর্শ ও নির্দেশিত বিধান অনুসরণই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে অবস্থান করে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নিজেদের নিয়োজিত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।